জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগৎ

বর্ষ ২১ ■ সংখ্যা ২৩ ■ ১৬ জুন ১৯৯৮ ■ ২ আষাঢ় ১৪০৫ ■ মূল্য ১২ টাকা

ব্যবধান-বিনাশী বিচিত্র
বিশ্বকাপ

লোকান্তরে সাঁতারের কিংবদন্তী ব্রজেন দাশ

লাইফবয়
স্বাস্থ্যের জন্য

আমার স্মৃতিতে ব্রজেন

এবিএম মূসা

মাত্র মাস দুয়েক আগে দেখা হল ব্রজেনের সঙ্গে। তখন কি জানতাম এ হবে শেষ দেখা, প্রায় অর্ধ শতাব্দীর সম্পর্কের ইতি ঘটবে? গত মার্চে কলকাতা গিয়েছিলাম। ব্রজেনের লেকটাউনের বাড়িতে একদিন পুরো আমি ও আমার স্ত্রী, ব্রজেন আর ছন্দা বৌদির সঙ্গে আড্ডা দিলাম। ব্রজেন তখনো অসুস্থ, হাসপাতালে কয়েকদিন থাকে আবার বাসায় আসে। দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিল, কয়েকদিন পরপর রক্ত নিতে হয়।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে পুরনো দিনের কথাগুলি চর্বিতচর্বন করছিলাম। ব্রজেন চেয়ারে বসা, আমি তার খাটে শুয়ে। পাশের ঘরে বৌদি আর আমার স্ত্রী নিজেদের মধ্যে খোশগল্প করছিলেন। তাদের দু'জনের পরিচয় ব্রজেনের বিয়ের দিন থেকে। পঁয়ষট্টি সালের মার্চে বা এপ্রিলে আমরা দু'জন কলিকাতায় তাদের বিয়েতে গিয়েছিলাম, বরযাত্রী দলে ছিলাম। ঢাকা থেকে আমরাই ছিলাম একমাত্র অতিথি। বিয়ের পর বৌদি যখন ঢাকায় এলেন, দু'জনকে নিয়ে কক্সবাজার বেড়াতে গেলাম, হই-চই করলাম। সেসব গল্পই হচ্ছিল, পুরনো দিনের নানা কাণ্ড-কারখানা নিয়ে হাসি-তামাশা চলছিল।

ব্রজেনের সঙ্গে পরিচয় পঞ্চাশ দশকের প্রথমে। আমি যখন তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভারে জুনিয়র রিপোর্টার। তখনকার দিনে সবাইকে সবরকম রিপোর্ট লিখতে হত, আমি প্রায়ই খেলাধুলার উপর লিখতাম। পাকিস্তান অলিম্পিকে ব্রজেনের সাফল্য, তারপর চ্যানেল সাঁতারের প্রস্তুতি, শেষ পর্যন্ত এই কৃতী সাঁতারুর অসাধারণ সাফল্য নিয়ে অনেক লিখেছি। শাহজাহান, এস এ মহসিন, শহীদ সাংবাদিক এস এ মান্নান, কোচ মোহাম্মদ আলী, মাঈনুল ইসলাম সবার প্রসঙ্গই সেদিনের আলোচনায় এসেছে। সবাই একে একে চলে গেছেন, তাঁদের সবারই অসামান্য অবদান রয়েছে ব্রজেনকে সামনে এগিয়ে দেয়ার পেছনে। এঁরাই উদ্যোগী হয়ে গঠন করেছিলেন চ্যানেল ক্রসিং কমিটি। উৎসাহ দিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী, (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) আতাউর রহমান খান। প্রাদেশিক সরকারের তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন আতা ভাই। সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে ব্রজেনের চ্যানেল সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছিল। তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য বা সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। এমনকি তখনকার সময়ে বিদেশী মুদ্রা অনুমোদনে যেসব কড়াকড়ি ছিল, তা শিথিল করে প্রয়োজনীয় পাউন্ড-স্টারলিং পাওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

চ্যানেল ক্রসিং কমিটি, যার সভাপতি ছিলেন মোহামেডান স্পোর্টিং-এর কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার মাঈনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক এস এ মহসিন (সাজু ভাই) ও কোষাধ্যক্ষ এফ করিম, দীর্ঘদিন ধরে ব্রজেনকে চ্যানেলে পাঠাবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। প্রথমে সুইমিংপুলে বিরামহীন সাঁতার, তারপর নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুরে লম্বা সাঁতার, এমনিভাবে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সেসব বিবরণী ইতিমধ্যে অনেকেরই জানা, ক্রীড়াজগতে এ সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধ আমি নিজেই লিখেছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ব্রজেন যে বড় কিছু করতে যাচ্ছে, এ নিয়ে যত কৌতূহল তা সীমিত ছিল কতিপয় ব্যক্তির মাঝে। পত্র-পত্রিকা, একমাত্র পাকিস্তান অবজারভার ব্যতীত অন্য কোথাও তেমন গুরুত্ব পায়নি।

সব প্রস্তুতির শেষে ব্রজেন যেদিন লন্ডন রওয়ানা হল, সেদিন বিমান বন্দরে আমরা মুষ্টিমেয় ক'জন মাত্র উপস্থিত ছিলাম। বিলেত থেকে মাঝে মাঝে তার খবর আসত, প্রধানতঃ মহসিন ভাই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে টেলিফোন করতেন। ঘটনাক্রমে মে মাসে, অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে ব্রজেনের বিলেত যাওয়ার মাস খানেক পরে আমি ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণ পাই। বিলেত পৌঁছে কোন এক রোববারে আমি ছোতার গেলাম ব্রজেন, ম্যানেজার মহসিন ভাই ও কোচ মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। সারাদিন ব্রজেনের অনুশীলন দেখলাম। গায়ে গ্রীজ মেখে সে পানিতে নামত, সারাদিন পানি দাবড়িয়ে বিকেলে উঠে পড়ত। আবার রাতে খাওয়ার পর পানিতে, মধ্যরাতে পানি ছেড়ে পাড়ে। ইংলিশ চ্যানেলের পানি সেই মে মাসেও দেখলাম বেশ ঠান্ডা। বিলেতে এই অনুশীলনের সময়ে তিনজনকেই অত্যন্ত কৃচ্ছতা সাধন করে কষ্ট করে চলতে হয়েছে। যে টাকা-পয়সা নিয়ে যেতে পেরেছে, তাতে তৃতীয় শ্রেণীর বর্ডিং হাউসে থাকতে হয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও তেমন প্রাচুর্য ছিল না। যা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনুশীলনের জন্য ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়।

অক্টোবরে ব্রজেন সাফল্যের মালা গলায় দিয়ে ঢাকা ফিরে এল। তখন সবেমাত্র আইয়ুব খানের মার্শাল ল' জারি হয়েছে। বিমান বন্দরে ক্রীড়ানুরাগীর ভিড় ছিল বটে, কিন্তু একজন বিশ্বজয়ী বীরের যে সংবর্ধনা পাওয়া উচিত ছিল তার সব আয়োজন চ্যানেল ক্রসিং কমিটির পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। তবে পরবর্তীতে তার এই সাফল্য যখন বিদেশী মাধ্যমে আলোচিত হতে থাকল, তখন শাসকদেরও নজর পড়ল তার উপর। কারণ ওভালে ক্রিকেট টিমের সাফল্যের পর ক্রীড়াক্ষেত্রে পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল ব্রজেনের চ্যানেল অতিক্রম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বছর চারেক আগে পাকিস্তান সফরের সময়ে হঠাৎ একদিন পিটিভি'র একটি অনুষ্ঠানে শুনি ক্রীড়াক্ষেত্রে সফল পাকিস্তানীদের নামোল্লেখের সময়ে ব্রজেন দাশের নামও বলা হয়েছে। অবশ্য বাঙালীর নতুন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। এ নিয়ে করাচি প্রেস ক্লাবে পাকিস্তানী সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে শুনলাম তাদের স্কুল-পাঠ্য বইতে এখনো ব্রজেনের নাম রয়েছে।

সরকারি স্বীকৃতির পর ব্রজেনকে আর পিছু তাকাতে হয়নি। পরবর্তী চ্যানেল অতিক্রমণ ও ইতালিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতা পাওয়া গেছে। তারপর ব্রজেন দাস কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে গেল। পরবর্তীতে তার সঙ্গে দেখা হল একাত্তরে মুজিবনগরে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন কাজেও তার সহযোগিতার বিবরণী অনেকেরই জানা নেই।

স্বাধীন বাংলাদেশে ব্রজেনের বিদ্যা, বুদ্ধি ও পেশাগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়নি। ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ করে সাঁতার ব্যবস্থাপনায় যে নিচুমানের রাজনীতি শুরু হয়েছিল– সে তার সঙ্গেও খাপ খাওয়াতে পারেনি। কিছুটা বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেল ব্রজেন, অবহেলায় ও আত্মসম্মানবোধ নিয়ে নিজেই সরে গিয়েছিল। এছাড়া জীবিকা নির্বাহের জন্যও নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হয়েছিল খেলার জগতের বাইরে। পঁচাত্তরের পর ব্রজেন দাশ আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে আনল। কারণ, যে সুইমিংপুলে তার খ্যাতির সূচনা, সেটিও স্বার্থান্বেষী মহল ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করছে দেখে কিছুটা মনঃক্ষুন্ন ও ব্যথিত হয়েছিল ব্রজেন। এই বেদনাবোধ প্রায়ই সে আমার কাছে প্রকাশ করত।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই ব্রজেনের খোঁজ পড়ল, তার মেধার সঠিক ব্যবহারের কথা ভাবলেন ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ। ওবায়দুল কাদের ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই আমার কাছে ব্রজেনের খোঁজ করলেন। সে তখন কলিকাতায় হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য। আমি খবর দিয়ে তাকে আনালাম, কিন্তু তখন সে অসুস্থ।

ব্রজেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিল একানব্বইয়ের প্রথম দিকে। তখন বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কলিকাতা থেকে ছন্দা বৌদি আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করলেন, ব্রজেনের ওপেন হার্ট সার্জারী করতে হবে, টাকার দরকার। আমার স্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব আলমগীর কবির ও ক্রীড়া সংগঠক কাজী আনিসুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করলেন। তাঁরা সরকারের তরফ থেকে তিন লাখ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সার্জারী করে সুস্থ হলেও এবার আক্রান্ত হলেন দুরারোগ্য ক্যান্সারে। তার আগে ব্রজেন ঢাকা এলেন, জনাব ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু চিকিৎসার জন্য আবার কলিকাতা যেতে হল। ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা, প্রচুর টাকার দরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার চিকিৎসার জন্য কলিকাতাস্থ হাইকমিশনের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রজেন আর সুস্থ হল না।

লেকটাউনের বাসায় আড্ডার সময়ে ব্রজেন বারবার শুধু বলেছে "একটু ভাল হলেই ঢাকা যাব।" আমি সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম, "নিশ্চয়ই যাবে, সুস্থ হবে, ভাল হবে। হয়ত একসাথেই ঢাকা ফিরব।" কয়দিন পরেই ঢাকা ফেরার আগে ফোন করে জানলাম ব্রজেন আবার হাসপাতালে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাড়াহুড়োতে দেখা করা হলো না, আমি ফিরে এলাম, ব্রজেনও শেষ পর্যন্ত এলো, তবে জীবিত ব্রজেন নয়। আমার শুধু মনে হয়, জীবনে ব্রজেনের সঙ্গে কত শতবার দেখা হয়েছে কিন্তু লেকটাউনের বাড়িতে সেই দেখা, যে শেষ দেখা তা বুঝতে পারিনি। ❐

সাঁতারের গর্ব ব্রজেন দাশ ঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান

সাঁতারু ব্রজেন দা'র সাথে শেষ দেখা হয়েছিল মাস কয়েক আগে, প্রেসক্লাবে। প্রেসক্লাবের ক্যান্টিনের কোন একখানে বসতেই ব্রজেন দা দূর থেকে তা দেখে আমার পাশে এসে বসলেন।

কুশলাদী জিজ্ঞাসা করার পর সেদিন দেশের সাঁতার ও সাঁতারুদের নিয়েই কথা হয়েছিল বেশি। বলছিলেন সাফ গেমস তো এসে যাচ্ছে, নতুন সাঁতারু বের না করলে গেমসে বাংলাদেশের পক্ষে ভাল ফল করা কঠিন হবে।

পঞ্চাশের দশকে প্রথম এশীয় হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হয়ে পুরনো ঢাকার ছেলে ব্রজেন দাশ ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তার অসাধারণ সাঁতার কৃতিত্বের বলে ব্রজেন দাশ বাঙালী জাতির নাম উজ্জ্বল করেছিলেন। তার সাঁতার কৃতিত্বের জন্য ব্রজেন দাশ প্রথম বাঙালী আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। সে সময়ে ব্রজেন দাশ ছিলেন বাঙালী জাতির গর্বের ধন– এখনকার ভাষায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান খেলাধুলা জগতের প্রথম 'সুপারস্টার'। মূলতঃ স্বল্পপাল্লার সাঁতারু থেকে তার দূরপাল্লার সাঁতারুতে পরিণত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত তাতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে দেশের সুনাম বাড়িয়ে দেশের মানুষের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়ে ব্রজেন দাশ এমন এক ক্রীড়া ব্যক্তিত্বতে পরিণত হয়েছিলেন– যাকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ সবসময় গর্ব করতে পারে।

সাঁতার তার কাছে ছিল নেশা। তিনি কখনো একে পেশা হিসেবে নিতে চাননি। এ জন্য সাঁতারে তার নানা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাফল্য ব্রজেন দাশকে কোন অহমিকা এনে দিতে পারেনি। এ দেশের সাঁতারের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হয়েও ব্রজেন দাশ কখনো তার সরলতা ও সহজতা হারাননি।

পুরনো ঢাকার ফরাশগঞ্জে লালকুঠির বিপরীত দিকে তার বাড়ি থাকায় ব্রজেন দাশ বাড়ির সামনে বুড়িগঙ্গা নদীতে সাঁতার শিখতে শিখতে একদিন যে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করবেন– এটা কেউ ভাবেনি। কোচিং বা টেকনিক বলে সাঁতারে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, ব্রজেন দাশ ভুলেও তার ধার-কাছ দিয়ে না গিয়েও যেভাবে বিশ্বের দূরপাল্লার সেরা সাঁতারুতে পরিণত হয়েছিলেন, তা কেবল রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজে পাওয়া যায়। নদীতে সাঁতার শিখে পুকুরের স্বল্পপাল্লার সাঁতারে কৃতিত্ব দেখানো দিয়ে ব্রজেন দাশের সাঁতার জীবনের শুরু। তারপর আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে সাফল্য তাকে ক্রমে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রাদেশিক সাঁতারে তার একচেটিয়া সাফল্য ব্রজেন দাশকে পাকিস্তানের জাতীয় সাঁতারে নিয়ে যায় এবং তিনি সেখানে স্বল্পপাল্লার সাঁতারে তার সাফল্যের নজীর গড়তে কসুর করেননি।

পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন হলে ব্রজেন দাশ তাতে অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বে অংশ নিয়ে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকা-চাঁদপুর সাঁতারে প্রথম হয়ে কৃতিত্ব দেখান।

এই সময়ে তার পরিচয় হয় বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক এস এ মোহসিনের সাথে। ক্রীড়া সংগঠনের 'ম্যানুকর' হিসেবে পরিচিত এস এ মোহসিন তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী সাঁতার সংগঠকদের সাথে এক বিরোধে জড়িয়ে পড়লে ব্রজেন দাশকে দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে অতিক্রম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জনাব মোহসিন প্রায় রাতারাতি চ্যানেল ক্রসিং কমিটি গঠন করে ব্রজেন দাশকে দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার জন্য ইংল্যান্ডে যান। সে দলে সাঁতারু ব্রজেন দাশের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহসিন। জনাব মোহাম্মদ আলীকে তার কোচ নিযুক্ত করা হয়।

১৯৫৮ সালে প্রথম এশীয় হিসেবে ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সের মধ্যবর্তী ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ব্রজেন দাশ ইতিহাস সৃষ্টি করেন। দেশে ফিরে আসলে ব্রজেন দাশ পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া ব্যক্তিত্বতে পরিণত হয়ে বাঙালী জাতির সম্মান বাড়ান।

গতবছর ভারতের ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু মিহির সেন মারা যান। কলকাতা তথা ভারতের পত্র-পত্রিকা তাকে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী প্রথম এশীয় সাঁতারু বলে আখ্যায়িত করলে আমি ব্রজেন দা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ব্রজেন দা জানান যে, মিহির সেন তার অনেক আগে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ের প্রচেষ্টা চালেও প্রকৃতপক্ষে তাতে সফল হন ব্রজেন দার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার বেশ পরে। ব্রজেন দাশ ছিলেন ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী প্রথম এশীয়। বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের উচিত ছিল ভারতের মিহির সেনকে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী প্রথম এশীয় খবরের প্রতিবাদ করা। কারণ ব্রজেন দাশের প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার মাস খানেক কি দু'মাস পর মিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল পার হন।

ব্যারিষ্টার-সাঁতারু মিহির সেন ও ব্রজেন দাশের মধ্যে বেশ সখ্যতা ছিল। কলকাতায় গেলে ব্রজেন দাশ প্রায়ই মিহির সেনের বাসায় গিয়ে তাদের পুরনো সাঁতার জীবন নিয়ে গল্পগুজব করতেন। মিহির সেনের পর চাঁদপুরের আব্দুল মালেক এবং আরো পর ফরিদপুরের মেয়ে কলকাতার আরতী সাহা ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

বছর কয়েক আগে (১৯৮৯) বাংলাদেশের আরেক সাঁতারু মোশাররফ হোসেন খান ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ব্রজেন দাশ এক অবিনশ্বর বিশ্বরেকর্ড গড়েন (যা অবশ্য কিছুদিন আগে ম্লান হয়ে গেছে)। ব্রজেন দাশের এ হেন ঐতিহাসিক কৃতিত্বে ইংল্যান্ডের মহামান্য রানী এলিজাবেথ তার দারুণ প্রশংসা করে পরিহাসচ্ছলে বলেন ঃ 'মি দাশ, আপনি তো ইংলিশ চ্যানেলকে আপনার গোছলখানায় (বাথ টাব) পরিণত করেছেন'।

বলাবাহুল্য, ব্রজেন দাশের ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার মধ্যে একবার না থেমে ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-ইংল্যান্ড ফিরতি চ্যানেল ক্রসিং তাকে বিশ্ব দূরপাল্লার সাঁতার জগতের 'বিস্ময়কর মানব' সম্মানে ভূষিত করে।

সাঁতারে তার এ কৃতিত্বের জন্য ব্রজেন দাশ পাকিস্তানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব 'তামঘায়ে পাকিস্তান' লাভ করেন। দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশ সরকার তাকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারে ভূষিত করেন।

ইংলিশ চ্যানেলের পর ব্রজেন দাশ ইতালির ক্যাপরি-নেপলসের ৩৩ মাইল দীর্ঘ সাঁতারে কৃতিত্ব দেখান। পাকিস্তানী আমলে পূর্ব পাকিস্তানী হওয়ায় ব্রজেন দাশকে নানা বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হতে হয়। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর সবাই মনে করেছিলেন ব্রজেন দাশের প্রতি এসব বঞ্চনা-অবহেলার ইতি ঘটবে। কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি।

দেশ স্বাধীনের পর সবাই আশা করেছিলেন ব্রজেন দাশকে বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সভাপতি করে সম্মান জানানো হবে। কিন্তু তা হয়নি। তাকে কিছু দিনের জন্য সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক করা হলেও হঠাৎ করে অজ্ঞাত কারণে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে একজন সাধারণ সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি করা হয়। বলে রাখা ভাল যে, সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে তাঁর চমৎকার সাংগঠনিক কৃতিত্বে মোশাররফ হোসেন খানের মত কালজয়ী সাঁতারুর প্রতিভা বিকাশ এবং জাতীয় সাঁতারে রেকর্ডসংখ্যক সাঁতারুর অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। সাঁতারু হিসেবে কালজয়ী কৃতিত্বের অধিকারী হলেও সাঁতার ফেডারেশনে তার উপস্থিতি সাঁতার অনুরাগীদের কাছে অপাংক্তেয় বলেই ঠেকেছে। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগে ভুগে ভুগে কাহিল হয়ে গেলেও তার সারল্য, নমনীয়তা ও মুখের স্বভাবজাত মিষ্টি হাসি কেড়ে নিতে পারেনি।

বাংলাদেশের সাঁতারের উন্নয়ন তার ধ্যান-জ্ঞান থাকলেও তা কার্যকরী করার ব্যাপারে তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ছিল। ঢাকায় কোন সাঁতারের আয়োজন বা অনুষ্ঠান হলে তাতে হাজির থাকার জন্য কোন আমন্ত্রণ পত্রের তিনি কোন তোয়াক্কা করতেন না। তিনি মনে করতেন এটা তার নিজের স্থান। এখানে আসার জন্য তিনি কোন রকম কালক্ষেপণ করতে রাজি নন।

দৈনিক বাংলার স্পোর্টস ডেস্কে এসে চা খেতেন আর তার দেশ-বিদেশের সাঁতারের নানা গল্প-অভিজ্ঞতার কথা বলে আমাদের মুহূর্তগুলিকে স্মরণীয় করে তুলেছেন– যার স্মৃতি এখন আমাদের পীড়া দেবে প্রায়শই। প্রেসক্লাবের সম্মানিত সদস্য থাকার সুবাদে তার সেখানে অবাধ গতি থাকায় প্রায়শই দেখা হয়েছে এবং গল্পে গল্পে কত অযুত সময় কেটে গেছে– যা আজ আমাদের কাছে এক মিষ্টি স্মৃতি বৈ কিছু নয়।

মহান সাঁতারু ও মানুষ ব্রজেন দাশের মধ্যে কোন ফারাক ছিল না। মানুষ ব্রজেন দাশের মধ্যে সবকিছু মিলিয়ে গিয়েছিল। সাঁতারের উন্নতি ও সাঁতারুর মঙ্গল যার জীবনের সবচেয়ে বড় কাম্য ছিল, সেই ব্রজেন দাশের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা জানানো হবে বাঙালী সাঁতারুদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাঁতারে কৃতিত্ব দেখিয়ে পুরস্কারে নিয়ে এসে। আমাদের সাঁতারুরা যেন একথা মনে রেখে সাঁতারে নামেন। ❐

লোকান্তরে সাঁতারের কিংবদন্তী ব্রজেন দাশ

সালমা রফিক

যে বুড়িগঙ্গা নদীতে পানির সাথে ছিল তার সখ্যতা, পানিই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান, পানির মাঝে বিচরণেই বিশ্বখ্যাত সেই বুড়িগঙ্গাতেই তিনি মিলিয়ে গেলেন সারাদেশে। তধু রয়ে গেল তার কীর্তিগাথা। 'জন্মিলে মরিতে হইবে' এই অমোঘ সত্য থেকে কারো রেহাই নেই। তাই আমাদের কিংবদন্তীর সাঁতারু ব্রজেন দাশকেও এই সত্য মেনে নিতে হয়েছে।

ওপেন হার্ট সার্জারীর পর ব্রজেন দা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে আসলে বেশিরভাগ সময়ই ক্রীড়াজগত কার্যালয়ে কাটাতেন। কখনও থাকতেন খুব উচ্ছল, কখনও বিষণ্ন। জীবনের শেষ লগ্নে এসে ব্রজেন দা ঢাকার লোকনাথ আশ্রমে একাই থাকতেন। কথায় কথায় তিনি ফিরে যেতেন বর্ণিল স্বপ্নময় রোমাঞ্চিত সেসব দিনগুলোতে। যেখানে তিনি ছিলেন মহানায়ক। ব্রজেন দা ক্রীড়াজগতেও লিখেছেন সাঁতারে তার কিভাবে পদচারণা শুরু ও উত্তরণ। তিনি যখন চ্যানেল বিজয়ী হয়েছেন, তখন আমি ক্লাস টু-এ পড়তাম। তাই চ্যানেলের মাহাত্ম্য তখন বুঝিনি। বুঝেছি পরে আমাদের পাঠ্য বইতে পড়ে। ব্রজেন দা'কে প্রথম দেখেছি ইন্টারস্কুল স্পোর্টস-এর এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ষাটের দশকের প্রথম ভাগে। ক্লাব এ্যাথলেটিক্স, প্রাদেশিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের সুবাদে ঢাকা স্টেডিয়ামপাড়ায় নিয়মিত দেখা হতো ব্রজেন দা'র সাথে। ব্রজেন দা তখন ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। ব্রজেন দাশ ফরাশগঞ্জে মওলা বখশ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উপদেষ্টা ছিলেন। মওলা বখশের বাড়িতেই ছিল ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব। এই ক্লাব '৬৭ সালে লালকুঠিতে নিয়ে আসা হয়। ব্রজেন দা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামকরা ফুটবলারও ছিলেন। ফরাশগঞ্জ এলাকায় কিন্তু তিনি লাড্ডু দা নামেই ছিলেন অধিক পরিচিত। যদিও তাদের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের সিরাজদিখী থানার কুচিয়ামোড়া গ্রামে। কিন্তু পুরো পরিবারই বসবাস করতেন ফরাশগঞ্জের ছোট্ট বাড়িটিতে। বাবা সেনাবাহিনীতে সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করতেন। কিন্তু ছেলেকে আসাম-বেঙ্গলের সিমেন্ট এজেন্ট করে দেন। ব্যবসায়ী হিসেবে ব্রজেন দাশ ছিলেন ঝানু ব্যবসায়ী। ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ের পর তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ব্রজেন দাশকে পুরনো ঢাকায় একটি সরকারি প্লট অরিজিনাল এলটমেন্টসহ দিয়ে দেন একটি সিনেমা হল করার জন্য। যার নামও দেয়া হয়েছিল চ্যানেল সিনেমা হল। কিন্তু ব্রজেন দা সব কাগজপত্রসহ এই জমিটি বিক্রি করে দেন পুরনো ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সিরাজ সাহেবের কাছে। পরবর্তীতে সিরাজ সাহেব তার নাম পরিবর্তন করে হলের নাম রাখেন মধুমিতা সিনেমা হল।

'৬৫ সালে ব্রজেন দাশ কোলকাতার মেয়ে ছন্দা বোসকে বিয়ে করেন। ছন্দা বৌদির বাবা প্রয়াত বোস ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম ও কমল দাশ গুপ্ত'র বেশ কাছের লোক। ছন্দা বৌ-দি কথায় কথায় বলেছিলেন তার ছন্দা নাম রেখেছিলেন কবি

ছন্দা দাশ

নজরুল ইসলাম। কোলকাতার মেয়ে বলেই ঢাকাতে ব্রজেন পরিবার একনাগাড়ে বেশিদিন থাকতেন না। পরবর্তীতে ছন্দা দাশ ছেলেমেয়েকে নিয়ে কোলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু ব্রজেন দাশ ঢাকা-কোলকাতা করেই তার জীবন কাটাতে লাগলেন। '৭৪-৭৫ সালে ব্রজেন দাশের প্রযোজনায় কোলকাতায় নির্মিত ছায়াছবি 'স্ত্রী' বেশ হিট ছবি হিসেবে মার্কেট পেয়েছিল। ছবির প্রধান ভূমিকায় ছিল উত্তম-সুপ্রিয়া। ব্রজেন দাশের ভাগ্য ছিল সবসময়ই সুপ্রসন্ন। কারণ তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার, পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের সব আমলেই ব্রজেন দাশ সবার কাছ থেকে যে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে এসেছেন। কেউ তাকে কখনও বিমুখ করেননি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোলকাতার ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য ব্রজেন দাশকে এক লাখ টাকা দান করেছেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত নাগরিক শোক সভায় ক্রীড়ামন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের মিসেস ছন্দা দাশকে বলেছেন, "আপনি যখনই বাংলাদেশে আসবেন, ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আপনার দেখাশুনা করবে। আর যদি থাকতে চান, তাও দেখবো আমরা।"

ব্রজেন দাশকে দাহ করার একদিন পর সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন ব্রজেন দাশের বিধবা পত্নী ছন্দা দাশকে ক্রীড়াজগতে নিয়ে এসেছিলেন। বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম বিক্রমপুরের ভিটেবাড়িতে কে কে আছে। বৌদি জানালেন, ব্রজেন দাশেরা তিন ভাই ছিলেন, সবাই মারা গেছেন। তাদের কোন বোন নেই। গ্রামের বাড়িতে যে ঘরটিতে ব্রজেন দাশ জন্মগ্রহণ

বৌদি জানালেন, ব্রজেন দাশেরা তিন ভাই ছিলেন, সবাই মারা গেছেন। তাদের কোন বোন নেই। গ্রামের বাড়িতে যে ঘরটিতে ব্রজেন দাশ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে ঘরটি এখনও আছে; তবে জরাজীর্ণ। ভাইয়ের ছেলেরাই দেখাশুনা করছে বলে ছন্দা দাশ জানালেন। ছন্দা দাশের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, এত বড় মাপের একজন সাঁতারুর ঘরণী হয়ে ছেলেমেয়ে দুটো, কেন সাঁতারু হিসেবে গড়ে তোলেননি? একথার উত্তরে তিনি বললেন, জানেন তো "ময়রার ছেলে সন্দেশ খায় না"।

করেছিলেন, সে ঘরটি এখনও আছে; তবে জরাজীর্ণ। ভাইয়ের ছেলেরাই দেখাশুনা করছে বলে ছন্দা দাশ জানালেন। ছন্দা দাশের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, এত বড় মাপের একজন সাঁতারুর ঘরণী হয়ে ছেলেমেয়ে দুটো, কেন সাঁতারু হিসেবে গড়ে তোলেননি? একথার উত্তরে তিনি বললেন, জানেন তো "ময়রার ছেলে সন্দেশ খায় না"। পাশে বসা মোশাররফকে বললাম, তুমিও কি একই পথ অনুসরণ করবে? সাথে সাথেই মোশাররফ বললো, "আমার মেয়েকে সাঁতারু হিসেবে গড়ে তুলেছি।"

এক ব্রজেন দাশ আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন, হাজারো ব্রজেন দাশ যেন ব্রজেন দাশের কীর্তিগাথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের সাঁতার অঙ্গনকে মহিমান্বিত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে– এ মুহূর্তে এটাই আমাদের কামনা। ❐

আমার কথা

ব্রজেন দাশ

ব্রজেন দাশ। উপমহাদেশীয় ক্রীড়াঙ্গনে একটি বিংবদন্তী পুরুষ। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে তিনি যে বৈভব এবং সম্মান ধারণ করেন, তেমনতর সংবেদনশীল প্রাপ্তি ক্রীড়াঙ্গনে আর কারো ললাটে স্থান পেয়েছে কিনা সন্দেহ। তিনিই প্রথম এশীয় যিনি এই দুর্লভ সম্মানটুকু লাভ করেন। সাঁতার পরিবারের এই ক্ষণজন্মা পুরুষ আজ সকল জানা-শোনার উর্ধ্বে। অনেক ক্ষোভ, অনেক জ্বালা তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন গহীন হৃদয়ে। অব্যক্ত অভিমানের সুর উচ্চারিত হয়েছিল তার কণ্ঠে বারবার।

১৯৮৫ সালের আগস্টে ক্রীড়া পত্রিকা 'হারজিত'-এ 'আমার কথা' শিরোনামে ব্রজেন দাশের ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেবার লোমহর্ষক কাহিনী প্রকাশিত হয়। লেখাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পুনঃমুদ্রণ করা হলো।

- সম্পাদক

অনেকের ধারণা– চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাশ মারা গেছে। ভাবাটা অস্বাভাবিক নয়। আমি যে এককালে সাঁতারু ছিলাম, সে বোধও ক্রমশ মন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এমনি সময় চ্যানেল বিজয় সম্পর্কে বলা অনেকটা দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া স্মৃতির পাতা উল্টাতে গেলেই মনটাও বিষণ্ন হয়ে যায়।

চ্যানেল বিজয়ের কথা বলতে গেলে পূর্বেকার অনেক কিছু বলতে হয়। কেননা নেপথ্যের এই ঘটনাগুলো আমাকে চ্যানেল অতিক্রম করার প্রেরণা যুগিয়েছে। অবশ্য মেখে মেখে বেলা তো আর কম হলো না। এখন জীবনের শেষ দিকে এগিয়ে চলেছি। ফলে পুরনো কথা বলতে গেলে অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলি।

১৯৫৫ সাল। পাকিস্তান অলিম্পিক। তাতে সাঁতারও অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ১০০ ও ৪০০ মিটার ইভেন্টে অংশ নেই। দু'টোতেই প্রথম স্থান অধিকার করি। অবশ্য ইতিপূর্বেই সাঁতারে আমার সুনাম-সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পুরো পাকিস্তানে সাঁতারে আমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। পরের বছর (১৯৫৬) অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অলিম্পিকের আসর। সমগ্র পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন খেলাধুলায় দল গঠন করা হলো। বিশেষ করে, পাকিস্তান অলিম্পিকে যারা চমৎকার পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, তাদেরকেই বিশ্ব অলিম্পিকে সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্বভাবতঃই আমার নিশ্চিত ধারণা, সাঁতার দলে আমি থাকবোই। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমাকে দলভুক্ত করা হলো না। পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের সাঁতারুদের নেয়া হলো। এতে আমার মন ভেঙ্গে গেল। তথাপি কিছু করার বা বলার নেই। তবে আমার মনে দারুণ জেদ চাপলো। কিছু একটা করার প্রবল ইচ্ছা হলো। সাঁতারে চমকপ্রদ এমন কিছু করতে হবে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের টনক নড়ে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা তো করলাম। কিন্তু কি করি! দিন কেটে রাত হয়। রাত কেটে দিন।

একদিন রোজকার মত খবরের কাগজ পড়ছিলাম। কলকাতার কোন এক পত্রিকা। পড়তে পড়তে হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। খবরটুকু বারংবার পড়লাম। কেননা কোন এক সাঁতারু চারবার প্রচেষ্টা চালিয়েও চ্যানেল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ তাকে নিয়ে ঢালাওভাবে লেখা হয়েছে। আমার মনে এই ঘটনাটি দারুণভাবে দাগ কাটে। তাছাড়া চ্যানেলের কথা আগে কখনো শুনিনি। ভাবলাম, চ্যানেল অতিক্রম করতে পারলে বোধহয় কিছু একটা করা যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। আমাকে চ্যানেল অতিক্রম করতেই হবে। অথচ তখনও চ্যানেল সম্পর্কে কিছুই জানি না। ফলে চ্যানেল সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে লাগলাম। চারবার চ্যানেল বিজয়ে যিনি ব্যর্থ হয়েছেন, তার অনুসন্ধান পেয়ে গেলাম। তিনি ভারতের লোক। তখন তৎকালীন দৈনিক আজাদের সাংবাদিক লাডু ভাই (স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত) ও আমি ভারত গেলাম। সেখানে গিয়ে চ্যানেল সম্পর্কে বেশ ধারণা পেলাম। ফলে আমি চ্যানেল অতিক্রমের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি তখন তদানীন্তন ক্রীড়াঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তি এস এ মহসিন (সাজু) ভাইয়ের শরণাপন্ন হলাম। তাকে আমার মনোবাসনার কথা খোলাখুলি বললাম। সাজু ভাই আমার কথায় থ হয়ে যান। বললেন, তুই ভাল করে ভেবে দেখ। পারবি কিনা! উনি চ্যানেল অতিক্রমের ভয়াবহতা বুঝালেন। কিন্তু আমি সিদ্ধান্তে অনড়। তারপর তিনি আমাকে যথেষ্ট ভাববার জন্য কয়েকদিন সময় দিলেন। আমি অনেক ভেবেচিন্তে চ্যানেল অতিক্রমের দৃঢ়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম। কেননা আমাকে কিছু একটা করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের চমকে দিতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ছলে-বলে-কৌশলে বাঙালীদের পিছিয়ে রাখছে। এর মাঝেও আমাদের জাগতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের বুঝাতে হবে– বাঙালীদেরও প্রতিভা আছে।

এতদ্ব্যতীত আমার অবশ্য দূরপাল্লার সাঁতার কাটার অভ্যাস রয়েছে। তৎকালীন ঢাকা-চাঁদপুর দূরপাল্লার সাঁতারে অংশ নিয়েছি। তাই সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে সাজু ভাইকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানালাম। উনি সবকিছু শুনে রাজি হলেন। তারপর আমাকে চ্যানেল অতিক্রমের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিতে উঠে-পড়ে লাগলেন। সেই সাথে সাংবাদিক বন্ধুরাও আমার জন্য যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করলেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমার চ্যানেল অতিক্রমের ব্যবস্থা হয়। বিশেষ করে, মহসিন ভাই, লাডু ভাই ও এবিএম মূসার কাছে আমি চিরঋণী।

১৯৫৮ সালের ৮ আগষ্ট। রাত পৌনে দুটো। এখনো শিহরণমূলক সে দিনের কথা মনের পর্দায় জ্বলজ্বল করে। গভীর অন্ধকার। সামান্য দূরের জিনিসও দেখা যায় না। কুয়াশার আবরণে ঢাকা। কনকনে ঠান্ডা পানি। তার পরে ঢেউয়ের পর ঢেউ। কেমন জানি রহস্যময়তা। এরই মাঝে সাঁতার শুরু হলো। ছেলে-মেয়ে সমেত বেশ ক'জন। ২১ মাইল দীর্ঘ পথ সামনে। তবে জোয়ার-ভাটার কারণে ৩৫ মাইল পাড়ি দিতে হবে। বিধাতাকে স্মরণ করে সাঁতরাতে লাগলাম। আমার সাথে সাথে বোটে করে চ্যানেল কমিটির পর্যবেক্ষক দল। আগে চ্যানেলের শুধু নামই শুনেছি। এখন সাঁতরাতে গিয়ে অনুভব করতে লাগলাম, চ্যানেল কি জিনিস! হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। তাতে অবশ্য দমে গেলাম না। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি! যেন বিশ্ব জয় করতে চলেছি। তবে ভাগ্যও আমার অনুকূলে ছিল। নতুবা চ্যানেল অতিক্রম করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। কেননা ঐ দিনের আবহাওয়া ছিল বেশ শান্ত। সাধারণতঃ চ্যানেলের আবাহাওয়া থাকে উত্তাল। উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে পড়লে বাঁচা দুরূহ ব্যাপার। অবশ্য চ্যানেলের শীতল রূপও কম নয়। দেখলে পিলে চমকে যায়। যা হোক, কপাল জোরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকি। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংগ্রাম করে অবশেষে চ্যানেল অতিক্রম করি। সময় লাগে ১৩ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। তখন কি যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস বলে বুঝানো যাবে না। একজন বাঙালী হিসেবে আমার বুক গর্বে ফুলে যায়। কারণ আমিই প্রথম বাঙালী হিসেবে চ্যানেল অতিক্রম করেছি।

আমি আমার বিশ্বাসকে এবং নিষ্ঠাকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি, এই আমার আনন্দ– এই আমার পরম সার্থকতা। একজন বাঙালী সাঁতারুর পক্ষে আমার এই প্রাপ্তিকে আমি কখনোই সাধারণ বলে মনে করি না। দেশ ও জাতি যদি এই থেকে সামান্যতম উপকৃত হয়, তবেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

অনুলিখন ঃ দুলাল মাহমুদ

লাইফবয়
স্বাস্থ্যের জন্য

আমাদের ব্রজেন দা

শামসুল আলম বেলাল

জাতীয় প্রেস ক্লাবেই ব্রজেন দা'র সাথে আমার প্রথম দেখা। পরিচয়ের সূত্র থেকেই উনি আমাকে সম্বোধন করতেন 'Hi Handsome' বলে। এ অপ্রত্যাশিত সম্বোধনে নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। কিছু হালকা কথারও বিনিময় হতো। তারপর হয় এক টেবিলে বসে খেয়ে-দেয়ে আড্ডা মারা, নয়তো পাশের টেলিভিশন রুমে টেলিভিশন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়া। তারপর জেগে উঠে দু'জনেই চা খেতাম ও নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে পা চালাতাম। ব্রজেন দা যেতেন ঢাকা ক্লাবে আর আমি আমার অফিস বাসস-এ। আমাদের এ দু'য়ের মাঝখানে সেতুবন্ধন হলেন মনোয়ার ভাই– প্রবীণ ফটোসাংবাদিক মনোয়ার আহমেদ।

ব্রজেন দা জাতীয় প্রেস ক্লাবের অতিথি সদস্য। দূর থেকে দেখেছি, তবে কখনও সেভাবে কথা হয়নি। মনোয়ার ভাই-ই ব্রজেন দা'র সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন ১৯৮৪ সালের প্রথম দিকে। যখন জানতে পারলেন আমি দুলালের ভাই, (ফেরদৌস আলম দুলাল, ১৯৮১ সালের ৭ মে তারিখে শ্রমিক নেতা আব্দুর রহমানসহ ভাড়াটে গুন্ডাদের হাতে নিহত। দুলাল সেসময় বাসস-এর সিনিয়র রিপোর্টার ছিলেন) ব্রজেন দা সস্নেহে আমার পিঠে ও মাথায় হাত বুলালেন। দ্বিতীয়বার দেখা হয় '৮৪ সালের মে মাসের মাঝামাঝি, সবে মাত্র বিয়ে করেছি। বউ কুমিল্লায় বাপের বাড়ি। মাত্র নয়দিন ছুটি নিয়ে বিয়ে পর্ব সেরে অফিসে জয়েন করলাম। সহকর্মীরা মসকরা করছেন। প্রধান সম্পাদক হাশেম ভাই (আবুল হাশেম, বাসস-এর এককালীন প্রধান সম্পাদক ও মহাব্যবস্থাপক- অধুনা লোকান্তরিত) দেখা হতেই বলে ফেললেন, "কি হে, এতো তাড়াতাড়ি?" মুখে সলাজ হাসি নিয়ে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে অফিস থেকে নেমে সোজা প্রেস ক্লাব। দেখা হতেই ব্রজেন দা ও মনোয়ার ভাই-এর টিপ্পনি কানের পর্দা ছিড়ে সোজা হৃদয়ের গহীনে। Hi Handsome বলে ব্রজেন দা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জানতে চাইলেন বউ দেখতে কেমন। মনোয়ার ভাইয়ের হালকা টিপ্পনি, "বেলাল বোধহয় পালিয়ে এসেছো", কোন কথার জবাব দিতে পারিনি। মনোয়ার ভাই অবিবাহিত, তবে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। ব্রজেন দা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, "আরে মন্, তুই হারা জীবন এভাবেই কাটাবি, তুই কি বুঝবি– বিয়া কারে কয়"। শুধু শুনেই যাচ্ছিলাম। জবাব দিতে পারিনি। কারণ ব্রজেন দা বা মনোয়ার ভাইয়ের সাথে তখনও এখনকার মতো অতো সহজ হয়ে উঠতে পারিনি।

তারপর দিন-মাস-বছর গড়িয়ে যেতে লাগলো, জাতীয় প্রেস ক্লাবে রোজকার মতো আমরা তিন অসম বয়স্ক বন্ধু কত গল্প করেছি। তার ফিরিস্তি এ অল্প পরিসরে বর্ণনা করা যাবে না। কখনও হাসি-ঠাট্টা, কখনও বা কোন বিষয়ে লম্বা বিতর্ক করে কাটিয়েছি। দেশে-বিদেশে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে আমরা আমাদের সময়গুলোকে প্রাণবন্ত করেছি দিনের পর দিন। আজ মনের মসৃন পাতায় এ অজস্র স্মৃতির সম্ভার জীবন্ত ইতিহাস হয়ে আছে। ব্রজেন দা নেই, তাই বলে পাশের চেয়ারটা খালি পড়ে থাকে না। আমি আছি, মনোয়ার ভাই আসেন, আরো অনেকেই আসেন যারা কালের আবর্তে ঘুরে ঘুরে একেএকে হারিয়ে যাবেন বিস্মৃতির অতলে। এটাই স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম।

গত ৩ জুন, ১৯৯৮ সন্ধ্যার কিছু পরে নিঃঅহংকার, অতিশয় ভদ্র ও সজ্জন ব্রজেন দা'র সাথে দেখা হয়েছে প্রেস ক্লাবের আঙ্গিনায়। Hi Handsome বলাতো দূরের কথা, মুখটি পর্যন্ত দেখালেন না। কালো কফিন বাক্সে আবদ্ধ তিনি। বুকের উপর সার সার তাজা ফুলের তোড়া, সন্দেহ হলো ব্রজেন দা বোধহয় রাগ করলেন। না, তাও নয়। হঠাৎ দেখি মনোয়ার ভাইয়ের দু'চোখ থেকে শীতলক্ষা ও বুড়িগঙ্গার অবিরল ধারা দু'গাল বেয়ে ক্রমে বুকের জমিনে মিশে যাচ্ছে। ব্রজেন দা'র আজীবন বন্ধু সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সমর দা'র (সমর দাস) বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছেন ব্রজেন দা'র স্ত্রী। সমর দা'র চোখে মুখে প্রিয় বন্ধুর বিয়োগ-ব্যথার অব্যক্ত প্রকাশ। গিয়াস ভাই (প্রখ্যাত সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী) স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন বাংলার সূর্যসন্তান ব্রজেন দাসের কফিনের দিকে। মুসা ভাইকে (এবিএম মুসা- প্রখ্যাত সাংবাদিক) মনে হলো দিশেহারা। যেন প্রিয়তম কোন কিছু হারিয়ে ফেললেন, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার মনিরুল আলম সাহেব হয়তো বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে, ব্রজেন দা আমাদের ছেড়ে অনন্তলোকে চলে যাচ্ছেন। আরও অনেকেই ছিলেন যারা নীরবে অশ্রু ফেলে ব্রজেন দা'কে বিদায় জানালেন। এতোক্ষণে বুঝলাম ব্রজেন দা দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় আবারও নেমেছেন এবং হেরেছেন। এ পরাজয় উনাকে নিয়ে গেলো অনন্তধামে আর আমাদের সবাইকে রেখে গেলো শোক সমুদ্রে।

প্রায় নিঃশ্চল পাথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি। সম্বিৎ ফিরে পেলাম প্রিয় সহকর্মী এনামের (এনামুল হক চৌধুরী) হাতের স্পর্শে। 'বেলাল ভাই আসি' বলে এনাম সাঁতার ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সাথে ব্রজেন দাকে একটা হালকা পিকআপে করে নিয়ে গেলেন শ্মশান ঘাটে। প্রেস ক্লাবের মেইন গেইট পার হতেই কাণে সেই মধুর আওয়াজ ভেসে এলো। ব্রজেন দা যেনো বলছেন, Hi Handsome, আসি। কাল দেখা হবে।" মনের গহীণ কোনে কে যেনো চুপিচুপি বলছে, ব্রজেন দা আর কোনদিন আসবে না। আসি বলে যে চলে গেলেন, এটা আমার কাছে চিরদিনের মিথ্যে হয়ে রইলো। জগতের আর সবার কাছে এটা অমোঘ সত্য। মনোয়ার ভাই চলে গেলেন তাঁর বাসায়। আমি ফিরলাম আমার বাসায়। রাত তখন ৯টা। জীবনে এই প্রথম তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলাম। হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে আছি। চোখ দুটো চলে গেলে নারকের পাতার ফাঁক দিয়ে সুদূর পূব আকাশে। হাজার হাজার তারার মাঝে ব্রজেন দাকে খুঁজছি।

বিক্রমপুরের কুচিয়ামোড়া গ্রামের মৃত হরেণ দাসের ছেলে ব্রজেন দাস। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান যখন কাপুরুষের মতো পাকিস্তানের গদি চুরি করে সারা পৃথিবীর ঘৃণা কুড়াতে লাগলো, তখন ৩০ বছরের বাঙালী টগবগে তরুণ ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে সারা দুনিয়ায় বাঙালী জাতিকে সুমহান মর্যাদার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পরপর ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে ও একই দিনে ২টি বিশ্ব রেকর্ড করে ব্রজেন দাস গ্রিনেজ বুক অব রেকর্ড-এ নিজের স্থান করে নিলেন। ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী এশিয়ার প্রথম মানব সন্তান। সম্ভবত চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে ব্রজেন দাসের উপর লেখা একখানি গদ্য আমাদের পাঠ্য ছিলো। পড়তাম আর রোমাঞ্চিত হতাম। ব্রজেন দা'র সাথে পরিচয় হওয়ার পর বিশ্বাসই হচ্ছিল না এই সাদা-সিধে লোকটা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন সাঁতার দিয়ে। একদিন আলাপ প্রসঙ্গে ব্রজেন দা অতিশয় শ্রদ্ধার সাথে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী

সাঁতারু ব্রজেন দাশ স্মরণে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত নাগরিক শোক সভায় বক্তব্য রাখছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, যুব ও ক্রীড়া সচিব এ এস এম শাহজাহান, বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সভাপতি ও নৌবাহিনী প্রধান বিয়ার এডমিরাল মোঃ নূরুল ইসলাম এবং ব্রজেন দাশের সহধর্মিনী মিসেস ছন্দা দাশ

ব্রজেন দাশের সহধর্মিনী ছন্দা দাশের হাতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোকবাণী তুলে দিচ্ছেন তথা প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ এবং যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

ব্রজেন দা অতিশয় শ্রদ্ধার সাথে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের কথা বলেছিলেন। ইংলিশ চ্যানেল সুইমিং-এ পাঠানোর ব্যাপারে উনার ভূমিকা সবচাইতে বেশি। পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন শের-ই-বাংলা, গভর্নর আজম খান, এয়ার মার্শাল আসগর খান ও আরও অনেকের কাছ থেকে। এদের সবার কাছে আজীবন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ব্রজেন দা। তাঁদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টার বিনিময়ে ব্রজেন দা বাঙালী জাতিকে এনে দিয়েছিলেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

১৯৮৬ সালে ইংলিশ চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশনের বিশেষ আমন্ত্রণে ব্রজেন দা ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। পেয়েছেন 'কিং অব চ্যানেল' বিশেষ ট্রফি। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাকিংহাম প্যালেসে তাঁকে চায়ের আমন্ত্রণ জানান। কিং ফিলিপ, প্রিন্স চার্লস, প্রিন্স এন্ড্রু ও প্রিন্স এডওয়ার্ড-এর সাথে করমর্দন করেন। প্রিন্সেস ডায়ানার সাথেও ব্রজেন দা করমর্দন করেন। ডায়ানা ব্রজেন দার ডান হাত তাঁর দু'হাতে চেপে ধরে খুবই মিষ্টি স্বরে অভিনন্দন জানান এতো বড় খ্যাতি অর্জনের জন্য। প্রেস ক্লাবের টেবিলে ব্রজেন দা আমাদের সবাইকে এ বিরল সম্মানের কথা বলেছিলেন। আর একবার পাকিস্তানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সফর করার পর ঢাকায় এসে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন আমাদের সবাইকে। এয়ার মার্শাল আসগর খান জানতে পেরেছেন ব্রজেন দাস পাকিস্তানে, উনি বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে শেষ পর্যন্ত ব্রজেন দাসের নাগাল পেলেন ও চায়ের আমন্ত্রণ জানালেন। ব্রজেন দা ঐদিন বিকেলে আসগর খানের বাসায় যেতেই জনাব খান উঠে এসে ব্রজেন দাকে জড়িয়ে ধরলেন। চা খেলেন, গল্প করলেন, অনেক স্মৃতি রোমন্থন করলেন। ব্রজেন দাসের দু'হাত চেপে ধরে আসগর খান হঠাৎ কেঁদে উঠলেন, "ব্রজেন, তোমাদের সবার কথা মনে হয়, দুর্ভাগ্য আজ আমরা দুই দেশ হয়ে গেছি। আমার জন্যে দোয়া করো। আমি তোমাদের সবার জন্যে দোয়া করি।" হঠাৎ ব্রজেন দার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু জমে উঠেছে। জিজ্ঞেস করতেই বললেন, "এ ধরনের লোকদের স্নেহ আমি বরাবরই পেয়ে এসেছি। অথচ আমি কে? কুচিয়ামোড়ার হরেন দাসের পোলা ব্রজেন দাস ছাড়াতো আর কিছু নই।"

ছাত্র জীবন থেকেই ব্রজেন দা দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় দেশে ও বিদেশে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। জীবনে "অগণিত পুরস্কার' ছাড়াও মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন অজস্র। এ বঙ্গে এমন প্রতিভাধর ও সাহসী ক্রীড়াবিদ আর কেউ জন্মগ্রহণ করেছে কিনা আমার জানা নেই। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সাঁতারে ব্রজেন দা'র কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। আর দশটি বাঙালী ছেলের মতো বাড়ির কাছে নদী বা খালে ব্রজেন দা সাঁতার শিখেছেন। কালের পরিক্রমায় এতো বড় সাঁতারু হবেন, ব্রজেন দা কখনও ভাবেননি। কৌতূহল বশত একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচ্ছা ব্রজেন দা, এমন সমস্যা সংকুল ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন কি ভাবে? ভয় পাননি? উত্তরে মিটিমিটি হেসে বলেছিলেন, "দেশের সবার কথা মনে পড়েছে, দেশের ইজ্জতের কথা মনে পড়েছে, যদি হেরে যাই মুখ দেখাবো কি করে– এই বোধটুকুই হয়তো আমাকে এই বিজয়ের সম্মান এনে দিয়েছে।"

বয়সে এতো বড়, কিন্তু কখনও টের পাইনি। আলাপে বুঝিয়ে দিবেন আমি উনার বন্ধু, ব্রজেন দা'র শরীর ছিলো হাতুড়ি পেটা। বেটে-খাটো ছিলেন তিনি। এক বিশেষ ভঙ্গিমায় হাটতেন। মুখে সারাক্ষণ হাসি লেগেই থাকতো। কখনও রাগতে দেখিনি। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সবাই ছিলেন উনার আপনজন। অনেক প্রবীণ সাংবাদিক আছেন, যাদের ধারে কাছে পৌঁছার সাহস আমার এখনও হয়নি। অথচ তিনি তাদেরকে তুই বলে সম্বোধন করতেন। আর তাদের সবার কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ব্রজেন দা।

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্রজেন দা ঘনঘন কলকাতা যেতেন। প্রতিবারই যাওয়ার আগে উনার সাথে দেখা হতো। বলতেন, " Handsome Checkup করাতে কলকাতায় যাচ্ছি, দোয়া করবেন।" এবার কেন যেনো বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন আমাকে। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, Handsome আপনাকে কেন এতো ভাললাগে জানি না, আপনার চঞ্চলতা, কখনও গম্ভীর হয়ে থাকা, হঠাৎ দু'লাইন গান গাওয়া বা দু'ছত্র কবিতা আবৃত্তি- সবকিছুই এক একটি ভিন্ন বেলাকে পরিচয় করিয়ে দেয়।" আমি বললাম, "ব্রজেন দা, আপনি বোধহয় কলকাতায় যাচ্ছেন"। উনি বললেন, "হ্যাঁ, এবার খুব খারাপ লাগছে। বোধহয় বাঁচবো না। কোন কথা বলতে পারিনি। নীরবে বিদায় জানালাম, এই শেষ দেখা। পরে বিভিন্ন সূত্রে খবর জানলাম, ব্রজেন দার অবস্থা অবনতির দিকে। ১ জুন সকাল ৬টা কলকাতার এক নার্সিং হোমে চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাস মারা গেলেন। সকাল ১১টা আমার অফিস বাসস-এ আমি এ খবর পেলাম। সাথে সাথেই মনে পড়লো ব্রজেন দা'র শেষ কথাটি, "এবার বোধহয় আর বাঁচবো না"।

আরেকবার দেখা হয়েছে। তখন উনার মুখে সেই প্রিয় সম্বোধনটি আর উচ্চারিত হয়নি। কারণ উনি তখন কালো কফিনের অন্তরালে দূরপাল্লার শেষ সাঁতারের পোশাকে আবৃত। আমরা কয়জন তখন চোখের কোণে নীরবে জমে থাকা অশ্রুকণাগুলো রুমালের বুকে জড়ো করছি। কানে তখনও বাজছে, "আমি কুচিয়মোড়ার হরেন দাসের পোলা, বিক্রমপুরের মানুষ আমরা, ভাঙ্গিওনা, মচকাইও না।" ❐

ব্রজেন দাশকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছেন যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের